দারসে কুরআন সিরিজ-৯

ইসলামী দন্ডবিধি

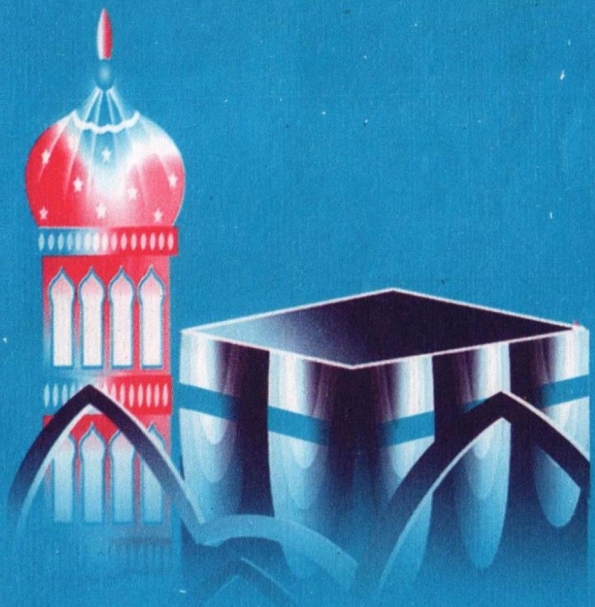

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ - ৯

ইসলামী দণ্ডবিধি

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

ইসলামী দণ্ডবিধি

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা ঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল
তৃতীয় প্রকাশ - জানু ঃ ১৯৯৮
দশম প্রকাশ - মে ঃ ২০১১

©
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস
৩৬ শিরিশ দাস লেন

মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

www.pathagar.com

সূচীক্রম

আয়াত	৫
অনুবাদ	৫
শব্দার্থ	৭
আয়াত থেকে বিশেষ শিক্ষা	৮
ইসলামী আইনে অপরাধের শ্রেণীবিভাগ	৯
আইন কি ও কেন	৯
১. আইনের বৈশিষ্ট্য	১১
প্রচ্ছন্ন শেরেকী	১১
২। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা	১৩
৩। আইন সংরক্ষণকারী সংস্থা	১৩
দেশে ইসলামী আইন কেন চালু নেই	১৪
ইসলামী আইনের প্রয়োজনটা কি?	১৬
ইসলামী আইনে যেগুলো দন্ডের আওতায়	১৭
আল্লাহর দৃষ্টিতে লোক হত্যা করা এবং হত্যার হাত থেকে কাউকে রক্ষা করা	১৯
আল্লাহর দৃষ্টিতে লোক হত্যার ব্যাপারে মানুষের হক	২০
শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা	২২
যে চুরিতে হদ প্রযোজ্য	২৩
আয়াতে কারিমা থেকে সিদ্ধান্ত	২৪
যেনার শাস্তি	২৪
ইসলামী দণ্ডবিধি ও গয়ের ইসলামী দণ্ডবিধির পার্থক্য	২৭
ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য	২৯
উপসংহার	৩২

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

ইসলামী দণ্ডবিধি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ * اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ * يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ * اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ * يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ز وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ * وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ * اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ ط يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

* المائدة

অনুবাদ ঃ যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে তাদের হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা তাদের একদিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে

www.pathagar.com

দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এ হচ্ছে তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা। এ ছাড়াও পরকালের কঠোর শাস্তি রয়েছে তাদের জন্য। কিন্তু যারা গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে, জেনে রেখ আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়ালু! ওহে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর রাস্তায় জিহাদ কর যেন সফলকাম হতে পার। যারা কাফের তাদের নিকট যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ থাকে এবং দুইটা পৃথিবীর সম্পদও যদি থাকে আর বিনিময় স্বরূপ তা সব কিছু দিয়ে যদি পরিত্রাণ পেতে চায় তবুও তাদের নিকট হতে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা দোজখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু বের হয়ে আসতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃত কর্মের সাজা হিসেবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত (শাস্তি)। আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত জ্ঞানময়। অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং নিজে সংশোধিত হয় নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। তুমি কি জান না যে আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীর আধিপাত্য একমাত্র আল্লাহর? তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। সূরা আল মায়েদা ৩৩-৪০।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ –

(سورة النور/ اية : ٢)

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়কে একশত দোররা (চাবুক) মার।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ কিছু অপরাধের কঠোর শাস্তির হুকুম দান করেছেন এবং শুধু শাস্তির কথা উল্লেখ করেই ক্ষ্যান্ত হননি, তিনি সংশোধনের কথাও বলেছেন। ফলে এই আইনে একদিকে যেমন কঠোরতার সাথে অপরাধ দমনের ব্যবস্থা রয়েছে অপর দিকে তেমনি মানুষ নিজের মধ্যে যেন আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে পারে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে সে জন্যে নরম ভাষায় হেদায়েতও করা হয়েছে। এভাবে এক অভিনব বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে আল্লাহ মানব সমাজকে অপরাধ মুক্ত করতে চান।

www.pathagar.com

শব্দার্থ ঃ جَزَاءُ - প্রতিদান। يُحَارِبُوْنَ - সংগ্রাম করে। يَسْعَوْنَ - সৃষ্টি করে। فِى الْاَرْضِ - পৃথিবীতে বা দেশের মধ্যে। فَسَادًا - হাঙ্গামা, বিপর্যয়। يُقَتَّلُوْا - হত্যা করা হবে। يُصَلَّبُوْا - শূলে চড়ানো হবে। اَوْ - অথবা। تُقَطَّعَ - কেটে দেয়া হবে। اَيْدِيْهِمْ - তাদের হাত। اَرْجُلُهُمْ - তাদের পা। (পায়ের আরবী এক বচনে رِجْلٌ- এবং হাতের আরবী এক বচনে (يَدٌ) هِمْ - তাদের। مِنْ خِلَافٍ - বিপরীত দিক থেকে। مِنْ - হতে বা থেকে। يُنْفَوْا - বহিষ্কার করা হবে। خِزْىٌ - লাঞ্ছনা, গঞ্ছনা। اِتَّقُوْا - তাওবা করে। تَابُوْا - তওবা করে। مِنْ قَبْلِ - পূর্বে। تَقْدِرُوْا - গ্রেফতারের। اللّٰهَ - আল্লাহকে ভয় কর। وَابْتَغُوْا - অন্বেষণ কর। اَلْوَسِيْلَةَ - নৈকট্য। جَاهِدُوْا - জিহাদ কর। فِىْ سَبِيْلِهٖ - তার রাস্তায়। لَعَلَّكُمْ - যেন তোমরা। تُفْلِحُوْنَ - তোমরা সফলকাম হতে পার। اَلَّذِيْنَ - যারা। كَفَرُوْا - কুফরী করে। مَا فِى الْاَرْضِ - যা কিছু পৃথিবীতে আছে। جَمِيْعًا - সব কিছু বা সমস্তই। وَ - এবং। مِثْلَهٗ - এর সম পরিমাণ। مَعَهٗ - তার সঙ্গে। لِيَفْتَدُوْا - ফিদিয়া দেয়া, দান করে বা বিনিময় হিসাবে দেয়। بِهٖ - উহা দ্বারা। (অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত ধন সম্পদ এবং তার ২ গুণ সম্পদ দ্বারা) مِنْ عَذَابِ - শাস্তি হতে (বাঁচার জন্য)। يَوْمِ - الْقِيٰمَةِ - কিয়ামতের দিন। مَا تُقُبِّلَ - গ্রহণ করা হবে না। مِنْهُمْ - তাদের নিকট হতে। يُرِيْدُوْنَ - তারা চাইবে। اَنْ يَّخْرُجُوْا - বের হতে (চাইবে)। مِنَ النَّارِ - আগুনের ভিতর থেকে। وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ - কিন্তু তারা বের হতে পারবে না। مِنْهَا - তা হতে অর্থাৎ জাহান্নাম হতে। اَلسَّارِقُ - পুরুষ চোর। اَلسَّارِقَةُ - মেয়ে চোর। فَاقْطَعُوْا - কেটে نَكَالًا مِّنَ - প্রতিফল। بِمَا كَسَبَا - যেমন কাম করেছে। جَزَاءً - নাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত (শাস্তি)। وَاللّٰهُ - এবং আল্লাহ।

www.pathagar.com

عَزِيْزٌ - মহাপরাক্রমশালী। حَكِيْمٌ - বিজ্ঞানময়। فَمَنْ - অতঃপর যে ব্যক্তি। تَابَ - তওবা করবে। مِنْ بَعْدِ - পরে। ظُلْمِهٖ - তার জুলুম করার। وَاَصْلَحَ - এবং সংশোধিত হয়ে যাবে। فَاِنَّ اللّٰهَ - তাহলে আল্লাহ। يَتُوْبُ عَلَيْهِ - তার তওবা কবুল করেন। اِنَّ اللّٰهَ - নিশ্চয়ই আল্লাহ। لَهٗ - তারই (আল্লাহরই)। مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - আসমান ও পৃথিবীর মালিকানা। يُعَذِّبُ - তিনি শাস্তি দিবেন। مَنْ يَّشَاءُ - যাকে ইচ্ছা তাকে। وَيَغْفِرُ - এবং তিনি মাফ করবেন। لِمَنْ يَّشَاءُ - যাকে ইচ্ছা তাকে। وَاللّٰهُ - এবং আল্লাহ। عَلٰى - উপরে। كُلِّ - সমস্ত। شَىْءٍ - জিনিসের। قَدِيْرٌ - ক্ষমতাবান। اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ - যেনাকারিনী ও যেনাকারী। فَاجْلِدُوْا - দোররা (চাবুক) মার। كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا - তাদের প্রত্যেককে। مِائَةَ - একশত। جَلْدَةٍ - দোর্রা।

আয়াত থেকে বিশেষ শিক্ষা

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে আমরা বেশ কতগুলো জরুরী বুঝ ও জরুরী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যথা–

(১) সামাজিক কঠিন অপরাধের শাস্তি শুধু পৃথিবীতেই নয়; বরং পরকালেও রয়েছে তার জন্য কঠোর শাস্তি।

(২) তওবা করলে অর্থাৎ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে অন্যায় করা থেকে বিরত হলে আল্লাহ ক্ষমা করতে প্রস্তুত।

(৩) চোর ডাকাত ও হাইজ্যাকার ধরনের অপরাধীরা গ্রেফতারের পূর্বে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ মা'ফ করবেন। কিন্তু গ্রেফতারের পরে ঠেকে পড়ে মা'ফ চাইলে মা'ফ হবে না।

(৪) তওবা করলে পরকালের শাস্তি মা'ফ হলেও কোন সামাজিক অপরাধের জন্য পৃথিবীর শাস্তি মা'ফ হবে না।

এখানে আরও একটি মূলনীতি জানা থাকা দরকার তা হচ্ছে ব হক নষ্ট করলে মা'ফ চাইতে হয় দুই জায়গায়। আল্লাহর নিকট তে চাইতেই হবে উপরন্তু যে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে তাঁর নিক চাইতে হবে। ঐ বান্দা মা'ফ না করলে আল্লাহ মা'ফ করবেন

www.pathagar.com

ইসলামী আইনে অপরাধের শ্রেণীবিভাগ

ইসলাম সামাজিক অপরাধের শাস্তিকে ৩ ভাগে ভাগ করেছে। যথা–

(১) হুদুদ – যার শাস্তি নির্দ্ধারিত যা মা'ফ করা যাবে না এবং যা কম বেশি করা যাবে না।

(২) কিসাস – যাতে বান্দার হক বেশী হওয়ার কারণে (ইসলামী আইনের) কোর্টের বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পরও বাদী তাকে ক্ষমা করে দিতে পারে। তবে বাদী ক্ষমা করলে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবে ঠিকই কিন্তু হাজত থেকে বের হতে পারবে না কোন দিনই অর্থাৎ সে আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করার সুযোগ পাবেনা।

(৩) তা'জিরাত – হুদুদ ও কিসাসের বাইরেও সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সব অপরাধের শাস্তি বিচারকের বিবেচনার ওপর ইসলাম ন্যস্ত করে। এ ধরনের অপরাধের শাস্তিকে তা'জিরাত বলা হয়। যার বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

এবার আসুন– ইসলামী আইনের দণ্ডবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পূর্বে 'আইন' সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করি।

আইন কি ও কেন

সর্বময় ক্ষমতার মালিকের নিকট থেকে যে নির্দেশ আসে ঐটাই আইন। আমরা কালেমা তাইয়েবা পাঠের মাধ্যমে স্বীকার করে নিয়েছি যে আল্লাহই একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার মালিক। তা হলে আইন হবে কোনটা? আল্লাহর নিকট থেকে যে নির্দেশ আসবে সেটাই হবে গোটা মুসলিম জাতির জন্য একমাত্র আইন। এখন জানা দরকার আইনের প্রয়োজন কি? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে এই যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কিছু সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে, যে প্রবৃত্তিগুলোর প্রয়োজন রয়েছে বেঁচে থাকার জন্য। এ প্রবৃত্তিগুলো হচ্ছেঃ

(১) খাদ্যগ্রহণ প্রবৃত্তি (২) ক্রীড়া প্রবৃত্তি (৩) আত্মত্ব প্রবৃত্তি (৪) আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি ও (৫) যৌন প্রবৃত্তি। এসব প্রবৃত্তির যেমন প্রয়োজন রয়েছে বাঁচার জন্যে, তেমন এ প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখার জন্যে। এইসব প্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সমাজের কিছু বাঁধাধরা নিয়ম শৃংখলাই হচ্ছে আইন। আর এটা এই জন্যে যে মানুষ যেন তার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে গিয়ে আইনের সীমা

www.pathagar.com

লঙ্ঘন না করে। আর যদি তা করে তবে মানব সমাজ আর মানব সমাজ থাকতে পারে না। মানব সমাজ তখন নিঃসন্দেহে পশু সমাজে পরিণত হবে। যেমন মানুষ আত্মত্ব প্রবৃত্তির প্রভাবে ধন সম্পদ মান ইজ্জত নিজের জন্য বেশী বেশী পেতে চায়। এ প্রবৃত্তি যদি অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চরিতার্থ হয় তবে চুরি ডাকাতি ইত্যাদি ধরনের চারিত্রিক দোষ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হবেই। যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ যদি অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় হতে থাকে তাহলে মানব সমাজ আর পশু সমাজে কোন পার্থক্য থাকবে না। ঠিক তেমনই অনিয়ন্ত্রিত আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষ একে অপরের হক নষ্ট করে নিজে ধনী হবে, ভোট ডাকাতি করে জনপ্রতিনিধি হবে, শক্তি প্রয়োগ করে অন্যের ধন সম্পদ লুটে নেবে। এ ভাবে মানব সমাজে নেমে আসবে এক স্থায়ী অশান্তি। সে অশান্তির হাত থেকে সমাজকে বাঁচার জন্যেই দরকার সামাজিক আইন। যে আইন নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষের যাবতীয় আচার আচরণ ও যাবতীয় সামাজিক কার্যকলাপকে।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কারণে মানুষ স্বভাবতঃই গড়ে উঠতে চায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে। এমন কি মানুষ সুযোগ পেলে যেমন অন্যের ধন সম্পদ লুটে নিতে চায় তেমন অন্যের একটা সুন্দরী স্ত্রীকেও নিজের জন্য পাওয়ার লোভ করে বসে, যার দৃষ্টান্ত সমাজে বিরল হলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়। এসব কারণেই প্রয়োজন সমাজে খুব শক্ত আইন, যে আইনের শাসন ছিন্ন করে কেউই কোন দুষ্কর্মে লিপ্ত হতে না পারে এবং সমাজ যেন অপরাধ মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে। আর মানুষ যেন কেউ কারও মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং যেন যার যার নিজের মৌলিক অধিকার পুরোপুরিভাবে আদায় করতে পারে।

এ সব দিক ও বিভাগকে সামনে রেখেই নাযিল হয়েছে আল্ কুরআনের মাধ্যমে সামাজিক আইন যা লঙ্ঘন করার কোন অধিকার নেই কারোরই এবং যা মেনে চলতে বাধ্য আমরা গোটা মুসলিম জাতি।

এ ছাড়া আইন সম্পর্কে আরও কিছু মূলনীতি জেনে রাখা উচিৎ, তা হচ্ছে এই যে– প্রথমত ঃ আইনের থাকতে হবে কিছু বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ আইনের সঙ্গে থাকতে হবে আইন প্রয়োগযোগ্য শক্তি। তৃতীয়তঃ থাকতে হবে আইন সংরক্ষণকারী সংস্থা। এবার আসুন সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহকারে বুঝার চেষ্টা করি যে এ সব বৈশিষ্ট্য গুলো কি কি?

www.pathagar.com

১. আইনের বৈশিষ্ট্য

ক. (১) আইন তাঁরই নিকট থেকে আসতে হবে যার নিকট মানুষ সর্বক্ষণই ঠেকা এবং যাঁর সার্বভৌমত্ব কায়েম রয়েছে গোটা মানব জাতির ওপর– তথা আসমান যমীনের সর্বত্র।

(২) আইন যার নিকট থেকে আসবে তাঁর প্রতি থাকতে হবে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি শ্রদ্ধা।

(৩) আইন এমন হতে হবে যা মানতে মানুষের মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজী হয়ে যায়।

(৪) আইন এমন হতে হবে যা মানতে মানুষের মৌলিক অধিকার, জান মাল ও মান ইজ্জতের রক্ষা কবজ হিসাবে নিশ্চয়তা দান করতে পারে।

(৫) আইনকে এমন হতে হবে যা প্রত্যেকটি মানুষকে সমান চোখে দেখতে সক্ষম।

কমপক্ষে এ বৈশিষ্ট্যগুলো যদি কোন আইনের সঙ্গে পাওয়া যায় তবে সেই আইনই হতে পারে সার্বজনীন এবং তার অধিকার থাকে সর্ব যুগে সর্ব দেশে ইতিহাসের হাজারও উত্থান পতনের পরও টিকে থাকার। এসব বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে একমাত্র আল্লাহর তৈরি আইনে; অন্য কারো তৈরি আইনে নয়।

খ. সেই সঙ্গে থাকতে হবে আইন বাস্তবায়নকারী বা আইন বাস্তবায়নের জন্যে পলিসি নির্দ্ধারণকারী সংস্থা। এই সংস্থাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'মজ্‌লিসে শুরা'। বর্তমানে এই সংস্থা বাংলাদেশে নেই। এর পরিবর্তে আছে 'আইন প্রণয়নকারী সংস্থা'। এই সংস্থার সদস্যগণ হয়ে থাকেন জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। এই নির্বাচিত সদস্যগণকে বলা হয় সংসদ সদস্য। এই সদস্যদের ভিতর থেকেই হন প্রধানমন্ত্রী।

প্রচ্ছন্ন শেরেকী

এমন একটি শেরেকী পৃথিবীর দু'একটা রাষ্ট্র বাদে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই শুরু হয়ে গেছে যেটাকে অন্যান্য রাষ্ট্র তো দূরের কথা, খোদ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও বুঝে বলে তাদের কার্য কলাপে মনে হয় না। তা হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ আইন তৈরি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। (সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতের অংশ।)

www.pathagar.com

এ ধরনের আয়াত আল কুরআনের শুধু এক জায়গায় নয় বহু জায়গায়ই আছে। আমি মনে করি আল্ কুরআনে বিশ্বাসীদের জন্যে যে কোন বিষয়ের উপর মাত্র একটা দলীলই যথেষ্ট।

এই সংস্থা (অর্থাৎ যেটাকে বর্তমানে বলা হয় 'আইন প্রণয়নকারী সংস্থা') সংসদে বসে এমন সব আইন তৈরি করে যেসব আইন আল্লাহর আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

আইন তৈরি করার অধিকার যেহেতু আল্লাহর, কাজেই এই অধিকার যারা আল্লাহর কাজ থেকে কেড়ে নিয়ে ভোটের মাধ্যমে অপরকে দান করে তারাও জ্ঞানের অগোচরে আল্লাহর অধিকারে অন্যকে অংশীদার বানায় (এরই নাম শেরেকী)। আবার জনগণের ভোট পেয়ে যারা আল্লাহ বিরোধী আইন তৈরি করে তারাও আল্লাহর অধিকার নিজেরা ভোগ করে। এ জন্যে তারাও জ্ঞানের অগোচরে হয়ে পড়ে (অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে) আল্লাহর অংশীদার। এটাও বড় ধরনের শেরেকী। কাজেই মানুষ ইসলামী বিধান মতে 'আইন প্রণয়নকারী সংস্থা' তৈরি করতে পারে না। পারে মাত্র আল্লাহর আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা তৈরি করতে যাকে বলা হয় 'মজলিসে শুরা'।

অত্যন্ত দুঃখ এবং আফসোসের সঙ্গে বলতে হয় যে এ ব্যাপারে দেশের কোন আলেম-ওলামা, মৌলভী-মাওলানা, পীর, সুফী, দরবেশ, কেউই যেন মাথা ঘামান না। আমার মনে হয় দেশের সমস্ত আলেম ওলামা পীর মাশায়েখ সুফী দরবেশ সবাই যদি মুসলমানদেরকে এই শেরেকীর ব্যাপারে সচেতন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে কোটি কোটি মুসলমান এই ধরনের শেরেকীর আগুনে পা দিতেন না। অন্য কোন দেশের কথা বাদ দিলেও অন্ততঃ বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানগণ আলেম ওলামা, পীর, মাশায়েখ ও মসজিদের ইমামদের কথা শোনে ও মানে। মানে বলেই তাদেরকে ফুরফুরা, আটরশি যেখানেই যেতে বলা হয় সেখানেই যায়। সাধারণ মুসলমান পরকালের মুক্তির জন্য আলেম ওলামাদের কথা মানে। তাই তারা মসজিদ. মাদ্রাসা, এতিমখানা ইত্যাদি স্থানে বহু টাকা পয়সা খরচ করে। তাদেরকে যদি বুঝানো হতো যে, আল্লাহর আইন তৈরির অধিকারে কাউকে অংশীদার করলে তার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং সকল প্রকার নেক আমল পরকালে কোন কাজে আসবে না তাহলে একজন মুসলমানও এ শেরেকী করত না।

আইন বাস্তবায়নের জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজন কি তা নিম্নে দেওয়া হলো।

www.pathagar.com

২। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

আইন থাকলেই তার প্রয়োগকারী সংস্থা থাকতে হবে। নইলে সে আইনের কোনই মূল্য থাকতে পারে না। যেমন দেখুন আমাদের দেশে একটা রাষ্ট্রীয় আইন আছে যে আইনের প্রয়োগকারী একটা সংস্থাও আছে– সেটা হচ্ছে পুলিশ বিভাগ।

রাষ্ট্রে আইন রয়েছে চুরি করা অপরাধ। যদি কেউ চুরি করে তাহলে সে আইন অমান্য করে। আর আইন অমান্য করলেই আইন প্রয়োগকারী পুলিশ বিভাগের লোক তাকে চোর হিসাবে গ্রেফতার করবে। যদি দেশে শুধু আইনই থাকত আর যদি পুলিশ বিভাগ না থাকত তাহলে বলুন আইনের কি মূল্য থাকত? কাজেই পুলিশ বিভাগ হচ্ছে এমন একটা সংগঠন যা মানুষকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করে। এ সংগঠন ব্যতীত আইন অচল।

৩। আইন সংরক্ষণকারী সংস্থা

অপরদিকে পুলিশ বিভাগের লোক তো চোরকে গ্রেফতার করবে কিন্তু তারা তো অচোরকে চোর বলে ধরতে পারে কিংবা চোরকেও অচোর বলে ছেড়ে দিতে পারে। শক্তি বলে পারে অনেক কিছু করতে। তাই রাষ্ট্র আরেকটি সংস্থা রাখে যে সংস্থা আইনকে সংরক্ষণ করে। এইটাই হচ্ছে বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগের কাজ হলো আইনের যথাযথ প্রয়োগের নিশ্চয়তা বিধান করা। এ কারণেই বিচারককে হতে হবে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাবমুক্ত। তাঁকে হতে হবে রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বিচারের ক্ষেত্রে কেউই বিচারপতির ওপর কোন প্রভাব খাটাতে পারবে না এমনকি রাষ্ট্র প্রধানও না। বিচারকের চাকুরী ও হতে হবে সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তার গ্যারান্টিযুক্ত। বিচারপতিগণের চাকুরীকে নিয়ন্ত্রণ করবে আইন। কোন ব্যক্তি– তা তিনি রাষ্ট্র প্রধান হলেও– নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। আর বিচারককে থাকতে হবে জনগণের থেকে এক নিরাপদ দূরত্বে। যেন বাদী বিবাদী কারও কোন প্রভাব না পড়তে পারে বিচারকের মনের ওপর। আর বিচারককে হতে হবে সর্বদাই সুস্থ ও নিরপেক্ষ মনের অধিকারী। তারা রায় প্রকাশে না তাড়াহুড়া করবেন আর না অকারণ সময়ক্ষেপণ করবেন। এমনটি হলেই আইনের একটি মূল্য থাকে; নইলে আইনের কোনই মূল্য থাকে না।

একটা নৌকার সঙ্গে নৌকার হাল, দাঁড়, পাল ও মাঝি-মাল্লার যে সম্পর্ক ঠিক তেমনই আইনের সঙ্গে উপরোক্ত শর্ত ও বৈশিষ্ট্যগুলোর

www.pathagar.com

সম্পর্ক। অর্থাৎ ধরে নিন আপনার একখানা নৌকা আছে কিন্তু তার হাল দাঁড় পাল মাঝি মাল্লা ইত্যাদি যদি না থাকে তা হলে ঐ নৌকায় আপনি উঠে বসতে পারবেন ঠিকই কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নৌকাটিতে উঠেছেন সে উদ্দেশ্য কিছুতেই হাসিল হতে পারে না। ঠিক তেমনই ইসলামের আইন থাকবে কিন্তু তার প্রয়োগকারী কোন সংস্থা থাকবে না, তার সংরক্ষণকারী কোন সংস্থাও থাকবে না, তখন সে আইন শুধু হাল দাঁড় বিহীন একটা নৌকার মত ভাসমান অবস্থায় পড়ে থাকবে। মাঝি মাল্লাবিহীন নৌকাকে যেমন স্রোতে বা বাতাসে যে দিকে ঠেলে নেয়, নৌকা সেই দিকেই দৌড়ায়, ঠিক তেমনি ইসলামী আইনেরও যখন প্রয়োগ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকে তখন তা ভাসমান নৌকার ন্যায় হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ভাসমান নৌকা যেমন নৌকার মালিককে তার গন্তব্য স্থানে বা পাড়ে নিয়ে যেতে পারে না ঠিক তেমনই ইসলামের আইনের যখন বৈশিষ্ট্য ও শর্তগুলো অনুপস্থিত থাকে তখন সে আইনও জনগণের মৌলিক অধিকার জান মাল ও মান ইজ্জত হেফাজতের কাজ সম্পাদান করতে পারে না।

যেমন মনে করুন কেউ চুরি করল। ইসলামী আইন বলে তার হাত কেটে দাও। এখন বলুন আমাদের এই মুসলিম সমাজে কে ঐ চোরের হাত কাটবে? তার হাত কাটার হুকুমটা বা দেবে কে?

এর জন্যই তো আল্লাহর রাসূল (স) একটানা বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত। অতঃপর এমন একটা সমাজ কায়েম করেছেন যে সমাজে যিনিই ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান তিনিই ছিলেন কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম, তিনিই ছিলেন মুফ্‌তি। তিনিই ছিলেন সেনাপতি। ফলে যার নিকট থেকে হাত কাটার হুকুম আসত তিনিই হুকুম দিতেন হাত কাটা কার্যকর করার। ফলে যতদিন পর্যন্ত রাসূল (স) প্রবর্তিত খেলাফত যুগ কায়েম ছিল ততদিন পর্যন্ত ঐ কয়টি ক্ষমতা এক হাতে ছিল যায় ফলে ইসলামী আইন মুতাবিক বিচারের রায় হতে পেরেছে এবং সে রায় কার্যকর হয়েছে। আর যখন থেকে ইমাম, মুফ্‌তি ও রাষ্ট্রপ্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হয়েছেন তখন থেকেই মুফতির ফতোয়া ফতোয়াই রয়ে গেছে, তা কার্যকর হতে পারেনি।

দেশে ইসলামী আইন কেন চালু নেই

বিষয়টিকে খুব ছোট্র একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চাই যে প্রায় শতকরা ৮৫% মুসলমানের দেশে কেন ইসলামী আইন চালু নেই।

www.pathagar.com

দেখুন বাংলাদেশের আইন আছে। আর সে আইনকে চালু রাখার জন্যে এর রয়েছে ঃ-

(১) আইন প্রণয়নকারী সংস্থা

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

(৩) আইন সংরক্ষণকারী সংস্থা।

কিন্তু আমরা যে ইসলামী আইন মানার কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি সেই ইসলামের যেহেতু আইন আছে কাজেই সে আইনকে চালু করতে হলেও থাকতে হবে ইসলামের হাতে ঐ তিনটি সংস্থা। কিন্তু তা কি ইসলামের হাতে আছে? না তা নেই। ইসলামী আইন মেনে চলতে হলে এবং অপরকে দিয়ে ইসলামী আইন মানাতে হলে ইসলামের হাতেও থাকতে হবে ঐ তিনটি সংস্থা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে বহু বড় বড় আলেম ওয়াজ নসিহত করেন কিন্তু এই মূল বিষয়ের উপর কাউকেই কিছু বলতে শুনিনা। বর্তমানে কারো ওয়াজ নছিহতের ধরন দেখে ব্যাপারটা এমনই মনে হয় যেমন– একজন রুগীর একদিকে রক্ত আমাশয় এবং অপর দিকে হয়েছে গায়ে খোস পাঁচড়া। এই রুগীর পেটে চিকিৎসা না করে খোস পাঁসড়ার চিকিৎসা করা হচ্ছে। তাহলে গায়ের উপরের চামড়া মসৃন দেখাবে ঠিকই কিন্তু রক্ত আমাশয়ে সে মরবে। বলুন এই রুগী যদি মরেই যায় তবে তার গায়ের চামড়া চক চকে হলে তাতে কোন লাভ হবে? না তা হবে না। এটা বুঝতে বেশী জ্ঞানের দরকার হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এই কথাটা আমরা ইসলামী বক্তারা বুঝলাম না। আমরা মানুষকে ওয়াজ শুনাচ্ছি, তার বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে হাজার টাকা কামাই করছি কিন্তু তাদেরকে বেহেশতের পথ দেখাতে পারছি না।

তিন চাকা ওয়ালা রিকসার যেমন যে কোন একটি চাকা না থাকলে তা চলতে পারে না ঠিক তেমনই ইসলামী আইন চলতে পারবে না ততদিন পর্যন্ত যতদিন না ইসলামের হাতে এনে দিতে পারব ঃ

(১) ইসলামী আইন প্রণয়নের জন্যে মজলিসে শুরা।

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং

(৩) আইন সংরক্ষণকারী সংস্থা বা ইসলামী বিচার বিভাগ।

এই ৩টি সংস্থা ইসলামের হাতে থাকলেই সেখানে ইসলামী আইন চলতে পারে। আল্লাহর নবী (স) ২৩ বছর ধরে একটানা বিরামহীন সংগ্রাম

www.pathagar.com

করে এই তিনটি সংস্থা ইসলামের হাতে এনে দেয়ার পরই আরব দেশে ইসলামী আইন চালু হয়েছিল।

ইসলামী আইনের প্রয়োজনটা কি?

যদিও এ প্রশ্নের জবাব মুসলমানদের প্রত্যেকেরই জানা থাকার কথা, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যেন এর উত্তর মুসলমানদের নিকট পুরোপুরিই অনুপস্থিত। এ কারণেই সংক্ষেপে এখানে এ মৌলিক প্রশ্নটির জবাব দেয়ার চেষ্টা করছি সহজ সরল উদাহরণের মাধ্যমে। জানি না এ জবাব গ্রহণ করার তৌফিক আল্লাহ্ ক'জনকে দিবেন।

একটি সহজ বিষয় চিন্তা করুন, বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান কি এটা মেনে নিতে পারবেন যে কেউ বাস করবে বাংলাদেশে আর আইন মেনে চলবে ভারতের বা পাকিস্তানের, কিংবা অন্য কোন দেশের? কিন্তু মানবে না সে বাংলাদেশের সাংবিধানিক আইন কানুন। এতে কি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী তাকে দেশের সুনাগরিক বলে মানবেন?

আমি আরো প্রশ্ন করবো। কেউ বাস করবে বাংলাদেশে, পড়ে সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আর পরীক্ষা দিতে চাইবে কলকাতা ইউনিভার্সিটির সিলেবাসে। তা কি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে পারেন? তা যেমন মেনে নেয়া সম্ভব নয়, ঠিক তেমনই আল্লাহর পক্ষে সম্ভব নয় যে কেউ বাস করবে আল্লাহর জমিনে, আল্লাহর রাষ্ট্রে, আর মেনে চলবে অন্য কারো হাতে বানানো আইন। এই জন্যেই তিনি যা-ই সৃষ্টি করেছেন তার চলার ও টিকে থাকার আইন তিনিই সৃষ্টি করেছেন। যেমন চাঁদ তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার চলার বা অমাবস্যা পূর্ণিমা হওয়ার আইন তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মহাশূন্যে পৃথিবীর টিকে থাকার, দিন রাত হওয়ার ও ঋতু পরিবর্তনের আইনও তিনি সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীকে কি ভাবে কোন গতিতে ঘুরতে হবে ও চলতে হবে তার আইন সেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যিনি এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।

কাজেই যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনিই মানুষকে টিকে থাকার জন্যে যা যা দরকার যেমন অক্সিজেন বহনকারী বায়ু, জলীয় বাষ্প বহনকারী বায়ু, ফলফলাদি যা খেয়ে বাঁচতে হবে তা, গাছপালা, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সেই আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করা দায়িত্ব আল্লাহরই; অন্য কারো নয়। ঠিক তেমনই মানুষের জন্যে রাষ্ট্রীয় আইন কানুন তথা

www.pathagar.com

দন্ডবিধি সৃষ্টি করার দায়িত্ব যে আল্লাহর সেই আল্লাহই তা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাঁর দেয়া সংবিধানই হচ্ছে আল্ কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব। আর আল কুরআনকে কিভাবে মানতে হবে তার জন্যে আদর্শ শিক্ষক হিসাবে দিয়েছেন আমাদের নবী (স) কে। তাই পৃথিবীর সকল মানুষের উচিত তারা যার তৈরী পৃথিবীতে বাস করে তারই দেয়া আইন মেনে চলা। আর তা না মেনে চললে ইহকালেও শান্তি থাকবে না, পরকালেও শান্তি পাবে না। এবার আসুন আমরা পূর্বের কথায় ফিরে যাই।

ইসলামী আইনে যেগুলো দন্ডের আওতায়

আল্লাহর এমন কিছু হুকুম আছে যা অমান্য করলে আল্লাহর হক নষ্ট হয়। তাতে দুনিয়ার কোন প্রাণীরই কোন প্রকার ক্ষতি হয় না, যেমন নামায না আদায় করা, রোযা না থাকা, এসব অপরাধে কোন বান্দার হক নষ্ট হয় না, তাই এ অপরাধের জন্যে কেউ বাদী হয়ে কোর্টে কোন বেনামাযীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে না। কাজেই এ সব অপরাধের শাস্তির জন্য জাহান্নাম রয়েছে।

কিন্তু–

(২) এমন কিছু আল্লাহর হুকুম রয়েছে যা অমান্য করলে তাতে আল্লাহর হক এবং বান্দার হক দুইই নষ্ট হয়। কাজেই এই পর্যায়ের অপরাধের শাস্তি দুনিয়ার কোর্টের বিচারেও হতে হবে এবং পরকালেও তার শাস্তি কোন কোন ক্ষেত্রে বাকী থেকে যাবে। এ ধরনের অপরাধ দুই প্রকার, যথা–

(১) আল্লাহর হক প্রবল বান্দার হক কম।

(২) বান্দার হক প্রবল আল্লাহর হক কম।

যেখানে আল্লাহর হক বেশী সেখানে দোষীর সাজা মা'ফ করার কোন অধিকার কোন মানুষের নেই, আর যেখানে বান্দার হক বেশী সেখানে সরকারের রায় ঘোষণার পর বাদীর অধিকার আছে ক্ষমা করে দেয়ার কারণ তাতে বান্দার হক ছিল প্রবল।

উদাহরণঃ

১. যেখানে আল্লাহর হক প্রবল সেখানে অপরাধীর শাস্তিকে হুদুদ বলা হয় যা কম বেশী করার বা মা'ফ করার অধিকার কোন মানুষের নেই।

www.pathagar.com

এই অপরাধ ৫প্রকার, যথা– (১) চুরি (২) ডাকাতি (৩) ব্যভিচার (৪) ব্যভিচারের অপবাদ। এ চারটি কুরআন দ্বারা প্রমাণিত আর পঞ্চমটি হচ্ছে মদ্য পান যার শাস্তি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে এ ৫টি অপরাধের শাস্তিই ক্ষমার অযোগ্য। অর্থাৎ এগুলোর যা শাস্তি তা না কম বেশি করা যাবে আর না ক্ষমা করা যাবে।

যেমন মাগরিবের নামায তিন রাকাত ফরজ এর স্থলে দুই রাকাত বা চার রাকাত করার অধিকার কারও নেই ঠিক সেইরূপ যে পাঁচ প্রকার অপরাধের শাস্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দ্ধারিত, সেখানে মানুষের কোন অধিকার নেই কম বেশী করার বা মা'ফ করার। অর্থাৎ ধরে নিন জায়েদের ঘরে ছমির চুরি করেছে। চুরির শাস্তি স্বরূপ ছমিরের হাত কাটার হুকুম হয়ে গেল। এ অবস্থায় জায়েদ যদি বিচারকের নিকট দরখাস্ত করে বা যে কোন পন্থায় বলে যে আমার ঘরে ছমির চুরি করেছে তাই আমি ছমিরকে মা'ফ করে দিলাম, আপনিও ছমিরকে ক্ষমা করে দিন। এরূপ ক্ষেত্রে জায়েদেরও কোন অধিকার নেই চোরের জন্য ক্ষমা চাইবার আর বিচারকের বা রাষ্ট্র প্রধানেরও অধিকার নেই চোরকে মা'ফ করে দেয়ার। ঠিক তেমনই অধিকার নেই এই পাঁচ প্রকার অপরাধীর কারও শাস্তিকে কম করার বা বেশী করার বা মা'ফ করার কারণ তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) কর্তৃক সুনির্দ্ধারিত। এ পাঁচটাতে আল্লাহর হক এই জন্যে বেশী ধরা হয় যে আল্লাহ মানব সমাজকে সুস্থ ও শান্তিময় রাখার জন্য ঐ কাজগুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যে নিষেধকে অমান্য করায় আল্লাহর হকই নষ্ট করা হয় বেশী। অপর দিকে বান্দার হকও সে সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে এখানে আল্লাহর হক প্রবল। এ থেকে একথাও বুঝা গেল যে মানুষের ঘরে চুরি ডাকাতি হলে, কেউ মদ পান করলে, ব্যভিচার করলে কিংবা ব্যভিচারের অপবাদ দিলে যেখানে মানব সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয় সেখানে আল্লাহ এই অপসৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীর ন্যায় অপরাধী মনে করেন।

২. আর দ্বিতীয়টি হলো কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যা। এখানেও আল্লাহর নির্দেশ "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে লোক হত্যা করে তাকে হত্যা করা তোমাদের জন্য ফরজ করে দেয়া হলো।" বলা হয়েছে সূরা বাকারার ১৭৮ আয়াতে–

www.pathagar.com

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط

অর্থাৎ তোমাদের ওপর হত্যাকান্ডের শাস্তি স্বরূপ কিসাসকে ফরজ করে দেয়া হলো। কেন তা করা হলো? এই জন্যে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ দিয়েছেন বাঁচার অধিকার। আর যিনিই দিয়েছেন বাঁচার অধিকার তিনিই অধিকার রাখেন জান কবজ করার। এ অধিকার কোন মানুষকে আল্লাহ দেননি। কাজেই যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তবে সে যেহেতু এক জনের আল্লাহ প্রদত্ত বাঁচার অধিকার কেড়ে নিল সেহেতু সে নিজের বাঁচার অধিকারও হারিয়ে ফেলল। বিচারের মাধ্যমে তাকে হত্যা করা আল্লাহ ফরজ করে দিলেন এবং বললেন–

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ *

البقرة ١٧٩

অর্থাৎ কেসাসের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জীবন (এর নিরাপত্তা)। ওহে জ্ঞানের অধিকারীগণ আশা করা যায় তোমরা এর তাৎপর্য অনুধাবন করবে ও আল্লাহ ভীতির পথ অবলম্বন করবে।

আল্লাহর দৃষ্টিতে লোক হত্যা করা এবং হত্যার হাত থেকে কাউকে রক্ষা করা।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا -

লোক হত্যার কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া যদি কেউ কোন নির্দোষী ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে সে যেন সারা পৃথিবীর সমস্ত লোককে হত্যা করল, আর যদি কোন ব্যক্তিকে কেউ হত্যার হাত থেকে উদ্ধার করে দেয় তাহ'লে সে যেন সারা পৃথিবীর মানুষকে বাঁচাল।"
(সূরা-মায়েদা)

এখানে আল্লাহর ভাষায় স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে একজন ভাল লোককে যে হত্যা করল সে যেন সারা পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করল। এইটাই যখন আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গি তখন লোক হত্যাকারীদেরকে আমাদের কোন নজরে দেখা উচিৎ? ইসলামের আইনের সুনির্ধারিত ব্যবস্থা হচ্ছে এই যে

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার পর সে যেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করতে না পারে ইসলামী আইন তার নিশ্চয়তা বিধান করে।

উপরোক্ত আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হলো যে, ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হতে যাচ্ছিল এমন এক ব্যক্তিকে যদি কেউ উদ্ধার করে দিতে পারে তবে তার এ কাজটা এত বড় উচ্চ মর্যাদার হবে যে সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যার হাত থেকে বাঁচানোর মত মর্যাদা ও সওয়াব সে আল্লাহর নিকট থেকে পাবে।

আল্লাহর দৃষ্টিতে লোক হত্যার ব্যাপারে মানুষের হক

আল-কুরআনে লোক হত্যার ব্যাপারে মানুষের হককে বড় করে দেখানো হয়েছে। এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে একটা লোকের বেঁচে থাকার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকে আরও কিছু মানুষের বেঁচে থাকার। যেমন ধরুন একটা পরিবারের ১২ জন লোকের মধ্যে মাত্র ১ জনই উপার্জন করে আর তার ওপর নির্ভরশীল আর ১১ জনের যে হকটা নষ্ট হলো সেটাকে আল্লাহ তাঁর নিজের হকের চাইতে ছোট করে দেখেন না তাই এখানে (লোকে হত্যার ব্যাপারে) বান্দার হককেই বড় ধরা হয়। সেই জন্যে লোক হত্যার দায়ে যখন এক জনের ফাঁসির হুকুম হয়ে যায় তখন ফাঁসিকে কার্যকর করার জন্য তাঁদের অনুমতি প্রয়োজন যারা ঐ নিহত ব্যক্তির অলি বা উত্তরাধিকারী। এ ক্ষেত্রে যেহেতু বান্দার হক প্রবল তাই আল্লাহ এ ব্যাপারে অর্থাৎ ফাঁসিকে কার্যকর করা বা না করার অনুমতি দানের ব্যাপারে তাঁকেই ক্ষমতা প্রদান করেছেন যার হকটা ছিল প্রবল। ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়ার পর বাদী তাকে ইচ্ছা করলে মা'ফ করে দিতে পারে। যদি মা'ফ করে তাহলে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে ঃ

فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (البقرة - ١٧٧)

"অতঃপর কেউ যদি তার ভাইকে মা'ফ করে দেয় (তা দিতে পারে) আর এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম মেনে হত্যাকারীর নিকট থেকে মৃত্যুপণ স্বরূপ অর্থ আদায় করতে হবে। যে অর্থটা পাবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ। এটা হচ্ছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে শাস্তি হ্রাস ও রহমত। এর পরও যদি কেউ অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে তবে তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।

আল-বাকারা, আয়াত ১৭৭ (বিস্তারিত পরে আসছে)

www.pathagar.com

আর তৃতীয় প্রকার শাস্তিকে বলা হয় তাজীরাত বা দন্ড। বর্তমান কালের প্রচলিত দন্ডবিধি আর ইসলামী আইনে দন্ডবিধির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এইখানে যে ইসলাম যেরূপ অপরাধের গুরুত্ব অনুযারী কোন কোনটার সাজার ব্যাপারে বিচারকের নিজ ইচ্ছা ব্যবহারের কোন অধিকার দেয়নি এবং কোন কোনটার ব্যাপারে বিচারকের নিজস্ব ফয়সালার অধিকার দিয়েছে এবং যাবতীয় অপরাধকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ (১) হুদুদ (২) কেসাস (৩) তা'জীরাত। তেমনি প্রচলিত কোন মানব রচিত আইনে নেই। মানব রচিত আইনে বহু ধারা সৃষ্টি করা হয়েছে, কোন ধারার অপরাধীর কি শাস্তি হতে পারে তা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয়টির ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে সুনির্দিষ্ট বিধান করে দেয়া হয়েছে। এবং তৃতীয়টির ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ চুরি, ডাকাতি, যেনা, যেনার অপবাদ, মদ্য পান এবং লোক হত্যা বাদে আর যত প্রকার অপরাধ আছে তার সবগুলোই শাস্তি বিধান বিচারক তাঁর নিজের চিন্তা বিবেচনা মুতাবিক করতে পারেন। অন্যভাবে বলা চলে, যা হুদুদ ও কিসাসের পর্যায়ে পড়বে না এ ধরনের অপরাধের কোনটার কি শাস্তি দেয়া উচিৎ তার নির্দিষ্ট কোন নীতিমালা তৈরী করতে বা অপরাধের গুরুত্ব মুতাবিক বিভিন্ন ধারা উপধারায় অপরাধকে ভাগ করে সাজাতে ইসলামী শরীয়ত নিষেধ করেনি। কাজেই ওটাও জায়েয তবে প্রথমোক্ত দুইটি ধারা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক সুনির্দিষ্ট তাতে রদবদলের কোন অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি এবং যাকে মানুষ হত্যা করার দায়ে ফাঁসির হুকম দেয়া হয় তাঁকে রাষ্ট্র প্রধানও মা'ফ করতে বা প্রাণ ভিক্ষা দিতে পারেন না; পারেন শুধু সেই মামলার ফরিয়াদী অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশ।

এ ছাড়াও কুরআন পাকে আঘাতের পরিবর্তে বা কিসাস প্রসঙ্গে তৌরাত কিতাবের বরাত দিয়ে আল্লাহ বলেছেন— فِيْهَا

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط

আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি বা ফরজ করে দিয়েছি যে জানের বিনিময়ে জান, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক,

www.pathagar.com

কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। এখানেও আল্লাহ এ সব ব্যাপারে বাদীকে ক্ষমা করার অধিকার দিয়েছেন এবং পরে এটাও বলা হয়েছে, যে অন্যকে মা'ফ করবে সে নিজেও মা'ফ পেতে পারবে। আর মা'ফ করার কারণে সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু যদি মা'ফ না করে তবে গোনাহগার হবে না তবে আঘাতের পরিবর্তে যে আঘাত তা যেন পরিমাণে বেশী না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

হুদুদের শাস্তি যেমন, কঠিন তেমন এর শাস্তি ততক্ষণ পর্যন্ত দেয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ ও সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহ পূরণ হবে। এ সম্পর্কে শরীয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে اَلْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ অর্থাৎ হুদুদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে যায়। হ্যাঁ তবে যদিও শর্তসমূহের অনুপস্থিতিতে হদ মা'ফ হয়ে যাবে কিন্তু তা'জীরাত মা'ফ হবে না। যেমন ধরুন কোন যেনাকারীর নির্দ্ধারিত বিধান মুতাবিক ৪টি সাক্ষী পাওয়া গেল না কিন্তু এমন তিনটি সাক্ষী পাওয়া গেল যার দ্বারা বিচারক সন্দেহমুক্ত হয়েই বুঝতে পারলেন যে যেনা ঠিকই হয়েছে কিন্তু সাক্ষী সংক্রান্ত ব্যাপারে শরীয়তের শর্ত পূরণ হলোনা অর্থাৎ সাক্ষীর সংখ্যা চারটি পুরল না। এক্ষেত্রে আসামী বেকসুর মুক্ত হয়ে যাবে না, এখানে বিচারক তার নিজের ইচ্ছা মুতাবিক কঠোর শাস্তি দিতে পারবেন, তবে তা হদের নিচে থাকতে হবে। ঠিক তদ্রূপ যাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তার ব্যাপারেও যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মৃত্যুদন্ড মা'ফ করে দেয় তবে এ ক্ষেত্রেও খুনী আসামী মুক্তি পেয়ে যাবে না, কারণ মৃত্যুদন্ডাদেশ মা'ফ করার অধিকার নিহত ব্যক্তির অলির কিন্তু দেশের সাধারণ লোকদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দায়দায়িত্ব সরকারের। কাজেই সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য বিচারক ঐ মা'ফ পাওয়া খুনী আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা আরও কোন কঠিন শাস্তি দিতে পারেন। যেন তার দ্বারা আর কোন খুন খারাবী ঘটতে না পারে। এ ব্যাপারে বিচারকের পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে।

www.pathagar.com

যে চুরিতে হদ প্রযোজ্য

যে চুরিতে হাত কাটার হুকুম সে চুরির ধরনটা কেমন— তা দেখার পরই হাত কাটার হুকুম প্রযোজ্য হবে; তার পূর্বে নয়। যে সব শর্ত হাত কাটার জন্য থাকতে হবে তা নিম্নে দেয়া হলো। যথা—

১। চুরির মাল কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন হতে হবে এবং মালিকানায় সন্দেহ থাকলে চলবে না। আর এমন মালও হবে না যাতে জনসাধারণের মালিকানা রয়েছে। যেমন ধরুন সরকারী রাস্তার ধারে একটা আমগাছ রয়েছে। সে গাছটা একজনের বাড়ীর নিকটে হওয়ায় সে আম গাছটি নিজের গাছের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং মনে করে সেটা নিজের গাছ। কিন্তু গাছটি সরকারী জায়গায় রয়েছে। এরূপ গাছের ফল চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। অথবা এই ধরনের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কোন কিছু কেউ চুরি করলে তাতে জনগণ সাধারণভাবে তার মালিকানায় শরীক রয়েছে কাজেই এ ধরণের কিছু চুরি করলেও তার হাত কাটা যাবে না, তবে তাজিরাত মা'ফ হবে না।

২। মালটিকে হেফাজত অবস্থায় থাকতে হবে। বেহেফাজত কোন মাল কেউ চুরি করলে সে চোরের হাত কাটা যাবে না। মালিক যদি তালাবদ্ধ ঘরে কিংবা কোন চৌকিদারের পাহারায় থাকে আর সেই অবস্থায় যদি তালা ভেঙ্গে বা সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে বা পাহারাদারের চোখ এড়িয়ে কোন দ্রব্য চুরি করে তবে তার হাত কাটা যাবে। কিন্তু অরক্ষিত মাল চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না, তবে অন্য শাস্তি থেকে তাকে রেহাই দেয়া হবে না।

৩। তা বিনা অনুমতিতে নিতে হবে, তবেই হাত কাটা হবে কিন্তু কোন কিছুর আংশিক নেয়ার জন্যে যদি অনুমতি দেয়া হয় আর সে যদি অল্প নেয়ার অনুমতি পেয়ে বেশী নিয়ে ফেলে তবে সেক্ষেত্রেও তার হাত কাটা যাবে না তবে অন্য শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

৪। মালটি গোপনে নিতে হবে। প্রকাশ্যে নিলে তা আর চুরি থাকে না; তা ডাকাতির পর্যায়ে পড়বে। তখন শুধু হাত কাটাতে শাস্তি হবে না। তখন এক পাশের হাত আর অপর পাশের পা কাটা লাগবে।

এ সব শর্ত পাওয়ার পর যখন তার হাত কাটা শাস্তি কার্যকর হবে তখন সে শাস্তি হবে কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক। কাজেই চুরিকে হতে হবে শরীয়তের সংজ্ঞা মুতাবিক চুরি।

www.pathagar.com

চুরির শরীয়তসংগত সংজ্ঞা হচ্ছে অন্যের মাল তার বিনা অনুমতিতে মালিকের হেফাজতের স্থান হতে অন্য স্থানে গোপনে নিয়ে যাওয়া। এই একটি মাত্র বাক্যের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে উপরোক্ত বর্ণিত চারটি শর্ত।

আয়াতে কারিমা থেকে সিদ্ধান্ত

(১) যদি কোন ডাকাত দল অস্ত্রশস্ত্র সহ ধরা পড়ে এবং কিছু ডাকাতি করে নিতে না পারে তবে কারারুদ্ধ কর, যমীনে বিচরণ বন্ধ করে দাও।

(২) যদি শুধু ডাকাতি করে মাল আসবাবপত্র ইত্যাদি নিয়ে যায়, আর লোক হত্যা না করে তবে এক পাশের হাত আর অন্য পাশের পা কেটে দাও। অর্থাৎ বাম হাত কাটলে ডান পা কেটে দাও।

(৩) ডাকাতি করতে গিয়ে যদি লোক হত্যা করে, আর মালপত্র না নেয় তবে তাকে কতল কর।

(৪) আর যদি লোকও হত্যা করে এবং মালপত্রও নেয় তবে শূলে চড়াও। হাইজ্যাক, লুটতরাজ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি ধরনের কর্মকাণ্ড উপরে বর্ণিত যে কোন পর্যায়ভুক্ত হবে এবং তার শাস্তিও সেই পর্যায়ের হবে।

যেনার শাস্তি

এর পর হুদুদের মধ্যে ৩য় স্থানে ব্যভিচার এবং ৪র্থ স্থানে ব্যভিচারের অপবাদ। এর শাস্তিও বড় কঠিন শাস্তি। কাজেই যেটাই কঠিন শাস্তি সেটাই হতে হবে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত। তাই এটা প্রমাণের জন্য শরীয়ত ৪ জন দেখা সাক্ষীর কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন, ব্যভিচারের জন্য ৪ জন দেখা সাক্ষী কখনও কি মিলবে?

এটা তো দেখা ছাড়া আরও লক্ষণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়; এসব ক্ষেত্রে কি শরীয়ত তাদের নির্দোষী মনে করবে? না, শরীয়ত তাদের নির্দোষী মনে করবে না, তা'জীরাত তাদের জন্য অবশ্য কার্যকর হবে কিন্তু ৪ জন দেখা সাক্ষীর পূর্বে তার উপর হদ বর্তাবে না। এর থেকে প্রমাণ হলো একটা মানুষ যখন এতটুকু বেপরোয়া ও এতটা পশু স্বভাবের হয়ে পড়ে যে লোকজনে দেখে ফেলবে সে তোয়াক্কা পর্যন্ত করে না তখনই তার ওপর শরীয়ত এমন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে যে শাস্তি প্রয়োগ করলে সে আর

www.pathagar.com

জীবনে বাঁচতে পারবে না। ফলে এটা হবে এমন এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যা দেখলে কেউই আর এ পথে পা বাড়াতে যাবে না।

এখানে লক্ষণীয় যে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলই এমন যে অন্যান্য জীব জানোয়ার যাদের বংশ পরিচয় নেই তাদের যৌন আচরণে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু মানুষের যেহেতু পিতা, বংশ, গোত্র ইত্যাদির পরিচয় আছে তাই এই পরিচয়কে নিখুঁত রাখার উদ্দেশ্যে ইসলাম বিবাহ ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এর পরও আমরা দেখতে পাই আল্লাহর ব্যবস্থাকে মানুষ যখনই লঙ্ঘন করে তখন এই দুনিয়ার জীবন যাপনেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে পড়ে। পশুর মধ্যে বহু কামিতার কারণে কোন রোগ হতে শোনা যায় না কিন্তু মানুষের মধ্যে বহু কামিতার কারণে নাকি গনোরিয়া সিফিলিস ইত্যাদি ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। ইদানিং এর চাইতে আরও ভয়ঙ্কর একটা রোগ সৃষ্টি হচ্ছে তাহলো 'এইডস' রোগ। এ রোগের উৎপত্তি স্থল হলো বেশ্যা খানা। প্রশ্ন, এসব রোগ পশুর না হয়ে কেন মানুষের হয়? এ হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে মানব সমাজকে আল্লাহ নিষ্কলুষ রাখতে চান। এই জন্যেই আল্লাহ এই ধরনের অপরাধ থেকে মানব সমাজকে রক্ষার উদ্দেশ্যে একদিকে করেছেন দৈহিক কঠোর শাস্তির বিধান অপর দিকে করেছেন কঠিন থেকে কঠিনতম রোগ দ্বারা অবরোধ সৃষ্টি। মনে হয় এই সমাজ ধ্বংসী রোগ থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার চরম উন্নতির যুগে গোটা পৃথিবীর মানব গোষ্ঠীকে ইসলামের দিকে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে এই এইড্স রোগটাকে আল্লাহ (নবী রাসূলের পরিবর্তে) হাদী করে পাঠিয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই হাদীর হাতে পৃথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের প্রাণ নাশের পর পৃথিবী আবার ফিরে আসবে ইসলামের দিকে এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্মই আর টিকতে পারবে না; টিকবে মাত্র ইসলাম যার প্রতিটি বিধানই যুক্তিগাহ্য, সত্য এবং সঠিক। এর মধ্যে আরো একটা বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে তা হচ্ছে— মানুষের রক্তের গ্রুপের মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা। সব মানুষের দেহে একই গ্রুপের রক্ত নয়। এটা পরীক্ষায় দেখা গেছে রক্ত শূন্য কোন ব্যক্তির দেহে যদি ভিন্ন গ্রুপের রক্ত দেয়া হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে তার

www.pathagar.com

Re-action প্রকাশ হয়। এতে রোগী মরেও যেতে পারে। এই রক্তের গ্রুপের বিভিন্নতার কারণে কিডনি পাল্টাতে হলেও কিডনি দাতার ও কিডনি গ্রহীতার কারণে বীর্যের গ্রুপও বিভিন্ন প্রকার হয়। এ কারণে একই নারীর রেহেমে বা গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের বীর্য প্রবেশ করলে তাতে সৃষ্টি হয় নানা মরণ ব্যধি যার বিভিন্ন নাম রয়েছে আর বর্তমানে আবিষ্কৃত নামটা হচ্ছে 'এইড্‌স' রোগ।

এই একই কারণে এক স্বামী ত্যাগ করে ভিন্ন স্বামী ধরতে হলে তাকে ৩ হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় যেন পূর্ব স্বামীর নুত্‌ফার (বীর্যের) ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশও আর বাকি না থাকে। এসবই মহান আল্লাহর বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থাপনা।

চতুর্থ, যেনার অপবাদ। এটার জন্য অপবাদকারীর মুখের কথাতেই তার অপরাধ প্রমাণ করবে। এ সব অপবাদে একটা মানুষের মান মর্যাদার ওপর আনে চরম আঘাত, তাই এ অপবাদ রটানো থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য চরম ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। ইসলাম যেমন মানুষের রক্তকে পবিত্র মনে করে অর্থাৎ মানুষের হাতে মানুষের গায়ের রক্ত ঝরুক এটা চায় না তেমন মানুষের মান মর্যাদা বিনষ্ট হোক, এটাও চায় না।

পঞ্চম, মদ্য পান। এ সম্পর্কে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে মদ্যপায়ীদের বিভিন্নভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছে। যেমন বুখারী শরীফের কিতাবুল হুদুদ অধ্যায়ে এসেছে ঃ

عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِى الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ اَبُوْبَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ -

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে রাসূলে পাক (সঃ) মধ্য পানের জন্য খুরমা গাছের ডালা দিয়ে ও জুতা দিয়ে মারধোর করেছেন এবং হযরত আবু বকর (রা) চল্লিশ চাবুক লাগিয়েছেন।

এ ধরনের অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে মদ্যপায়ীকে এ ভাবে মারধোর করা হয়েছে এবং ৪০ চাবুক লাগান হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী দণ্ডবিধি ও গয়ের ইসলামী দণ্ডবিধির পার্থক্য

ইসলামী আইনের দন্ড বিধি ও প্রচলিত গয়ের ইলরামী আইনের দন্ড বিধির মধ্যে যে গুণগত পার্থক্য তা নিম্নে দেখানো হলো ঃ

ইসলামী আইনের দন্ডবিধি	প্রচলিত বৃটিশ বা ভারতীয় আইনের দন্ডবিধি
১। চুরির শাস্তি হাত কাটা এতে চুরি বন্ধ হয়। কারণ এর শাস্তির কোন মা'ফ নেই ও কোন কনসেশন নেই।	১। চুরির শাস্তি জেল খাটা। এতে চোর জেল খানার ডাকাতদের নিকট হতে চুরি ডাকাতির ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়। পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে ছোট চোর হয়, বড় চোর আর বড় চোর, হয় ডাকাত।
২। যেনার শাস্তি 'রজম' অর্থাৎ নীচের অর্দ্ধাঙ্গ মাটিতে পূঁতে পাথরের আঘাতে হত্যা দন্ড দেয়া অথবা অবস্থা ভেদে ১০০ চাবুকের আঘাত করা। এতে যেনার প্রবণতা দূর হয় কারণ এ শাস্তিতে কোন মা'ফ নেই বা কনসেশন নেই বরং শাস্তিটা খুবই কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক।	২। উভয়ের সম্মতিতে হলে বেকসুর খালাস। যেনার লাইসেন্স থাকলে এটা কোন অপরাধই নয়। এতে যেনা বন্ধ হওয়ার তো কথাই নয় বরং এতে যেনা বৃদ্ধিই পায়।
৩। রাহাজানি, ডাকাতি, খুন খাবারি ইত্যাদির শাস্তিও বড় রকমের এবং দৃষ্টান্তমূলক। ফলে ইসলামী সমাজ কায়েম হলে অপরাধ প্রবণতা একেবারেই কমে যায়।	৩। রাহাজানি, ডাকাতি, খুন খারাবী ইত্যাদির শাস্তি সশ্রম কারাদন্ত। প্রত্যেকটি অপরাধ থেকে সুপারিশ ও ঘুষ দিয়ে বাঁচা যায়। তাই এ সব অপরাধ সমাজে বাড়তেই থাকে; কমে না।
৪। মদ্য পানের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যভিচারের, তাই মদ্য পানে রয়েছে কঠোর শাস্তি।	৪। এটা কোন দোষনীয় কাজ বলেই বিবেচিত হয় না। ফলে মদ খোর বৃদ্ধি পায় সঙ্গে সঙ্গে যৌন অপরাধও বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

৫। লোক হত্যায় হত্যার বদলে হত্যা এটাকে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। বাদী মা'ফ করলেও এ আসামী জেল থেকে বের হতে পারবে না। ফলে জনজীবন খুনী অপরাধী মুক্ত থাকে। কথায় কথায় হত্যার প্রবণতা লোপ পায়।

৫। মানুষ হত্যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড। রাষ্ট্র বিপ্লবের কারণে কিংবা সরকারের পাইকারী ক্ষমা ঘোষণার কারণে খুনী অপরাধীরাও জেল থেকে বের হয়ে আসে। আবার ক্ষমতাসীনদের দলের লোক খুনী হলে তদবীরের জোরে রেহাই পেয়ে যায়। ফরিয়াদী পক্ষের কিছুই করার থাকে না। আইনের এ স্বেচ্ছাচারিতার ফাঁকে খুনী অপরাধী লোকে সমাজ ছেয়ে যায়। ফলে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এ থেকে কমপক্ষে ২ টি বিষয়ের ওপর আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ যথা–

(১) ইসলামী আইন তথা ইসলামী আইনের দন্ডবিধি যদি সমাজে কায়েম হয়ে যায় আর কঠোর ভাবে দন্ড প্রদানের ফলে চোর, ডাকাত হাইজ্যাকার, মদখোর, ব্যভিচারী ইত্যাদি অপরাধী যদি সমাজে না থাকে তাহলে সমাজে অশান্তি প্রবেশ করার আর কোন চোরা পথ কি খোলা থাকে?

এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে 'না' অশান্তি প্রবেশের আর কোন চোরা পথই খোলা থাকে না। যেমন রাসূলে পাক (স) এর শাসন আমলে অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর ১টি মাত্র মহিলা চোরের হাত কাটার পর আর কোন প্রকার চুরি সমাজে ছিলনা, মানুষ দরজা খুলে রেখে ঘুমাতে পারতো। দোকান খুলে রেখে ঘুমাতে পারতো। দোকান খুলে রেখে নামাযে যেত, কেউ দোকান থেকে এক কপর্দকও ধরার সাহস পেতো না। সমাজে ছিল পূর্ণ নিরাপত্তা।

(২) যে আইনে চোর বদমাশদের দমনের এত সুন্দর ব্যবস্থা সে আইন প্রবর্তিত হয় না কেন? কে বাধা দেয়?

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হচ্ছে যারা অপরাধী তারাই শাস্তিকে ভয় করে। আর যখন এমন অবস্থা হয় যে যারাই অপরাধী তারাই আইনের ঘরের

www.pathagar.com

মালিক তা হলে তারা এমন আইন কিছুতেই প্রবর্তন করতে রাজি হবে না যে আইনে তাকেই পাকড়াও করবে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাই বলা চলে ইসলামের আইন যতই ভাল হোক না কেন যদি আল্লাহভীরু, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আইন প্রনয়ন, আইনের প্রয়োগ ক্ষমতা ও আইনের সংরক্ষণ ক্ষমতা না থাকে তবে ইসলামী আইন সমাজে চালু হতে পারে না।

ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীতে যত প্রকার শাস্তির আইন আছে তার মধ্যে ইসলামের আইনই সব চাইতে কঠোর। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল করা। এর জন্য প্রয়োজন অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দেয়া যেন মানুষের ভিতরকার অপরাধ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এবং মানুষের জান-মাল ও মান ইজ্জতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়। প্রকৃতপক্ষে শাস্তি আইনের এই কঠোরতার মধ্যেই রয়েছে নিরীহ লোকের জান মাল ও মান ইজ্জতের নিরাপত্তা। এ কারণেই দেখা যায়, যে দেশ ইসলামের দিকে যত বেশী অগ্রসর সেই দেশে অপরাধ তত কম। যেমন সৌদি আরবে যে পরিমাণ ইসলামী আইন আছে সেখানে সেই পরিমাণ অপরাধ কম। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও দেখেছি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত যখন বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে ইসলাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিল সেই সময় এ দেশে অপরাধ এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, বাংলাদেশের বিগত ইতিহাসে তার নজীর নেই। দেখুন ২৪/১১/৭৫ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে লিখেছে মুজিব আমলের বিভিন্ন অপরাধের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব। (১৯৭২-১৯৭৫ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)।

ডাকাতি	১৭,২৯৬
রাহাজানী	১৪,১৮৭
সিঁধেল চুরি	৫৪,৩৯৭
চুরি	৬৩,৪৭০
খুন	১৩,৮৬১
দাঙ্গা	৩২,১৫৯
অন্যান্য অপরাধ	১,০২,২২৪
সর্বমোট	**২,৯৭,৫৯৪**

www.pathagar.com

উপরে বর্নিত উপাত্তটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরকারী রিপোর্ট ও পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের যোগফল মাত্র। পাঠক মাত্রই জানেন যে, শতকরা কতটি অপরাধের ঘটনা থানায় ডায়রী হয় কিংবা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে যতগুলো অপরাধ সংঘটিত হয় তার একচতুর্থাংশ পত্র পত্রিকায় কিংবা থানায় রেকর্ড হয় না। দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের শত শত চুরি ডাকাতি, খুন খারাবী ও দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর শহর পর্যন্ত এসেও পৌঁছায় না। বিশেষভাবে ঐ সময় অপরাধীদের বিরুদ্ধে থানা পুলিশ বা কোর্টে মামলা করা সহজ ব্যাপার ছিল না। যাদের বুকের পাটা ছিল আর যারা একান্তই কিছু করতে চাইত তবে তা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই করতো। তাই আমরা মনে করি যে প্রকৃত অপরাধের সংখ্যা প্রদত্ত তালিকার চাইতে কয়েকগুণ বেশীই ছিল।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলার অবনতির আরো প্রমাণ মিলে জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর রিপোর্ট থেকে। দৈনিক বাংলা ৩রা আষাঢ় ১৩৯৪ বাংলা মুতাবেক ১৮ই জুন, ১৯৮৭ইং তারিখে " ষোল বছরের খুন" শিরোনামে সম্পাদকীয় লিখেছে। তাতে বিগত ১৬ বৎসরে বাংলাদেশে মানুষের জান মালের নিরাপত্তাহীনতার করুণ চিত্রটি ফুটে উঠেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রিপোর্টে বলেছেন " বিগত ১৬ বছরে বাংলাদেশে সংঘটিত হত্যাকান্ডের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারেরও বেশী।" সরকারী রিপোর্ট অনুসারেই বুঝা যায় যে প্রতি ২২০০ লোকের মধ্যে একজন অন্যায় ভাবে নিহত হয়েছে। অপরাধের এ সয়লাবের প্রকৃতপক্ষে দু'টি কারণ ছিলঃ

প্রথমত ঃ ধর্ম নিরপেক্ষতার ছদ্মবরণে ধর্মহীনতার চর্চা পরকালে জবাবদিহি ও আল্লাহভীতির বন্ধন শিথিল হয়ে পড়লে মানুষ ন্যায়নীতি শুধু সামাজিকতার কারণেই করে থাকে। সমাজের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হেন অপরাধ নেই যা সে করতে পারে না। ফলে সমাজে অপরাধের সয়লাব বইতে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ আইন প্রয়োগে শিথিলতা। আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগের ফলে সাময়িক ভাবে হলেও সমাজ খানিকটা সুস্থ থাকে। যদিও অপরাধের ক্যান্সারে সমাজের মেরুদন্ডকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। আইনের শাসন ক্ষত বিক্ষত সমাজদেহে বাহ্যিক প্রলেপের কাজ করে।

উপরোক্ত দু'টি ব্যধিই ১৯৭২ হতে ১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে অপরাধের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

আইন প্রয়োগ প্রসঙ্গে আমরা ইউরোপের উন্নত দেশ গ্রেট বৃটেনের কথা

www.pathagar.com

উল্লেখ করতে পারি। পৃথিবীর মধ্যে গ্রেট বৃটেন অন্যতম কল্যাণ রাষ্ট্রও বটে। বৃটেনের নাগরিক অধিকার, দেশাত্মবোধ. আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আইন প্রয়োগে নিরপেক্ষতা সব কিছু মিলে দেশটি পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর মধ্যেও মোটামুটি শীর্ষে রয়েছে। সেই বৃটেনেই অপরাধের মাত্রা কি পরিমাণ তা একটা দৈনিকের সম্পাদকীয় থেকে হুবহু তুলে দেয়া হলো।

দৈনিক সংগ্রাম ঢাকা ঃ ১৫ই চৈত্র, ১৩৯৩ সাল, ৩০ শে মার্চ ১৯৮৭ইং

(সম্পাদকীয়)

সিনহুয়া পরিবেশিত খবর, ইইসি দেশসমূহের মধ্যে বৃটেনের কারাবন্দী লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। প্রতি এক লাখ মানুষের ৯৫ দশমিক ৩ জন কারাবন্দী। লুক্সেমবার্গে প্রতি লাখে ৮৮ দশমিক ৫, পশ্চিম জার্মানীতে ৮৭ দশমিক ৯ এবং ফ্রান্সে ৮৪ জন। বৃটেনের একশত ৫৫টি কারাগারে কারাবন্দীদের ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই অবস্থা। দ্রুত হারে বেড়ে যাওয়া অপরাধের হারই এখন মূল সমস্যা। অপরাধীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আটকের ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না।

বৃটেনের কারাগারগুলোতে কারাবন্দীদের সংখ্যা ইইসি ভুক্ত দেশগুলোর চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। এই সংবাদের দু'টো দিক রয়েছে। তার একটি হলো বৃটেনের সমাজে অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। অপরটি হলো অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোন অপরাধী আইনকে ফাঁকি দিতে পারছে না অথবা অপরাধীদের সংখ্যা এত বৃদ্ধির কারণে প্রশাসন কখনও অসহায়বোধ করে অপরাধীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে নামকাওয়াস্তে দায়িত্ব পালন করছে না, অপরাধের স্রোতের তোরে আইনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেন মোটেই ভেঙ্গে যায়নি বা পাশ কেটে যেন তেন ভাবে অন্যপথ ধরে চলেনি তা আইনের সুস্থতার লক্ষণ। এটাকে যেভাবেই যে কেউ ব্যাখ্যা করুণ না কেন, আমরা মনে করি এটা বৃটেনের সমাজে আইন প্রয়োগের একটা ভাল দিক। আইন প্রয়োগ ক্ষেত্রে যদি কখনও বাধা সৃষ্টি না হয় এবং আইন প্রয়োগের নিরপেক্ষতা থাকে আর থাকে প্রয়োগের গতি তাহলে অবশ্যই আশা করা যায়, সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হলে এবং হিতকর মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার ব্যবস্থা থাকলে অপরাধের ঘটনা হ্রাস পাবে এবং অপরাধীদের অন্তত একটি অংশও অপরাধ প্রবণতার আক্রমন থেকে কিছুটা রেহাই পাবে। বৃটেনে অধিক হারে অপরাধী পাকড়াও হওয়া অবশ্যই একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হতে পারে। অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে অপরাধীদের পাকড়াও অপরাধ দমনে কল্যাণকর হতে পারে নিঃসন্দেহে। একথা অবশ্য আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, বৃটেনের সমাজে অপরাধ বৃদ্ধির এমন

www.pathagar.com

বহু কারণ আছে যার অনেকই আমাদের সমাজে নেই। আমরা মনে করি, কোন অপরাধী যদি আইনের হাত থেকে রক্ষা না পায়, তাহলে আমাদের সমাজে অপরাধ দ্রুত হ্রাস পাবার সম্ভাবনা বৃটেন থেকে অনেক বেশী।

তবে শুধু আইনের প্রয়োগ এবং ক্রমবর্ধমান পাকড়াও অপরাধ দমন করতে পারে না। তা পারলে বৃটেনে অপরাধ আইনের এমন প্রয়োগের পর অপরাধ প্রবণতার হার সেখানে কমতো। কিন্তু তা কমেনি। আসলে আইনের প্রহরা মানুষকে সর্বক্ষণ অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত রাখতে পারে না , যদি তাদের মনে বিবেকের প্রহরা শক্তিশালী ভাবে সর্বক্ষণ বর্তমান না থাকে। এই বিবেককে সর্বক্ষণ সজীব ও শক্তিশালী রাখতে পারে আল্লাহভীতি এবং পরকালে জবাবদিহির ভয়। এছাড়া আরেকটা জিনিস প্রয়োজন, সেটা হলো মানুষের জন্যে মানুষের স্রষ্টা-নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা। পশ্চিমী দুনিয়া ইসলামী আইনের শাস্তির ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে। তাই একদিকে সজীব ও শক্তিশালী বিবেকের প্রহরা, অন্যদিক আল্লাহ– নির্ধারিত শাস্তির ব্যবস্থা না থাকার ফলে পশ্চিমী দুনিয়ার মানুষের অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। কিন্তু সৌদী আরবে ইসলামী অপরাধ আইনের মোটামুটি প্রয়োগের ফলে সেখানে অপরাধ প্রবণতা কমছে। অপরাধপ্রবণতা কমার একমাত্র দৃষ্টান্ত বোধ হয় সৌদী আরবই। আমরা নিশ্চিত যে ইসলামী শাস্তির আইন ও বিচার ব্যবস্থার বাস্তবায়ন হলে পৃথিবীর সবদেশে, সব জনপদেই অপরাধপ্রবণতা কমবে। জাগতিক অনেক দিক দিয়ে অগ্রসর পশ্চিমী দুনিয়া এবং মুসলিম বিশ্বের এ বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন আছে।

উপসংহার

হয়তো একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি না তাহচ্ছে এই যে মুসলমানদের দেশে ইসলামের খেলাফ যে সব আইন রয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন করতে আমরা অক্ষম হয়েছি। যেমন, আমরা কি কখনও চিন্তা করেছি যে বেশ্যাবৃত্তির লাইসেন্স দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর আইনকে অমান্য করার লাইসেন্স দেয়া। ঠিক তদ্রুপ মদের লাইসেন্স বা যে কোন প্রকার অবৈধ কাজের লাইসেন্স দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর হুকুম অমান্য করার লাইসেন্স দেয়া। এটা যে আল্লাহর সঙ্গে কত বড় বিরোধিতা তা যাদেরই সামান্যতম বোধ শক্তি আছে তারা সহজেই বুঝতে পারে ! আমরা আশা করব, আল্ কুরআন থেকে যখন যতটুকু বুঝতে সক্ষম হব তখন ততটুকু মেনে চলার মত যেন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি।

ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ

www.pathagar.com

LIGHT DOT GRAPHICS POINT

খন্দকার প্রকাশনী
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০